তব গৃহ নহে অন্ধকূপ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রয়াত সেলিনা বাহার জামানকে আমরা সবাই কোনো কোনো ভাবে জানতাম। না-জেনে উপায় ছিল না। আমার নিজের কাছে তাঁর যে ভাবমূর্তি স্থায়ী হয়ে আছে সেটি নৃত্যের। ১৯৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয়েছিল। সেলিনা তাতে মায়ের ভূমিকায় মঞ্চে এসেছিলেন। নৃত্য, অভিনয়, সংলাপ বলা– সবকিছু অবলীলায় করেছেন। তাঁর সেই সপ্রতিভ ও প্রাণবন্ত ভূমিকা আমার কাছে অমলিন। রোগাক্রান্ত সেলিনাকেও আমি দেখেছি; কিন্তু সেটি নয়, আসল মানুষটি হচ্ছেন ওই নৃত্যরতা সেলিনা বাহার জামান।

কিন্তু বৃত্ত তো থাকে। মঞ্চে থাকে, থাকে সমাজে, কার্যকর দেখা যায় রাষ্ট্রে। এই বৃত্ত অনেক ধরনের; একটা ধরন পুরুষতান্ত্রিকতার। একে চিনতে সুবিধা হয় পিতৃতান্ত্রিকতা বললে, কেননা এই বৃত্ত কেবল যে মেয়েদেরকে আটক করে তা নয়, পুরুষদের ওপরও বিলক্ষণ কর্তৃত্ব করে।

পিতৃতান্ত্রিকতা নতুন নয়, খুবই পুরাতন ব্যবস্থাপনা বটে। অনেককাল ধরে সে টিকে আছে, কিন্তু একালে সে নতুন রূপ নিয়েছে। এই রূপটির নাম হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ বিশেষভাবেই, এবং চরিত্রগত কারণেই পিতৃতান্ত্রিক। এই পিতা কেবল ভরসার স্থল নন, তিনি ক্ষমতারও প্রতীক। পিতৃতন্ত্রকে একটি অবস্থান না-বলে উপায় নেই; সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি আদর্শও। পুঁজিবাদ আমলাতন্ত্রকেও সাহায্য করে, যে আমলাতন্ত্র কেবল যে প্রশাসনিক তা নয়, বাণিজ্যিকও। তার একাধিপত্যে কোনো ছাড় নেই।

পিতৃতন্ত্র সামাজিক অগ্রগতিকে আটকে দেয়। সেলিনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুবিধা ছিল যে তাঁর পিতা হাবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন উদারহৃদয় ও গণতান্ত্রিক। মুসলিম লীগের রাজনীতি এক সময়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল, সেই টানে হাবীবুল্লাহ বাহারের মতো অনেক প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার মানুষও সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু এঁরা, বিশেষভাবে হাবীবুল্লাহ বাহার সেখানে স্বস্তিবোধ করেননি। তাঁর ওপর কত প্রচন্ড স্নায়বিক চাপ যে পড়েছিল সেটা টের পাওয়া যায় সেই ১৯৫৩ সালেই মন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায়। তারপরে তের বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু কথা বলতে পারেননি। ভিন্নভাবে অবশ্যই, তবে স্নায়বিক চাপ কাজী নজরুল ইসলামের ওপরও পড়েছিল, যার কারণে অমন প্রাণবন্ত মানুষটিও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন।

হাবীবুল্লাহ বাহারের ওপরে চাপটা পড়েছিল সরাসরি রাষ্ট্রীয় কারণে। পাকিস্তান ছিল একটি আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যার চরিত্র ছিল অসংশোধনীয় রূপে পিতৃতান্ত্রিক। বাহার এই রাষ্ট্র চান নি; এবং এর তৎপরতা দেখে কেবল হতাশ নয়, পীড়িতও হয়েছেন বলে ধারণা করি। 'পাকিস্তান'কে তিনি যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর দুটি বক্তব্য থেকে। প্রথমটি ১৯৪১-এর, পাকিস্তান আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে তখনকার; অপরটি ১৯৪৮-এর, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের। প্রথমটিতে যে-মূলনীতির ওপর পাকিস্তানের দাবির ভিত্তি বলে তিনি মনে করেন তার কথা উল্লেখ করেছেন; দ্বিতীয়টিতেও একই বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন।

তাঁর মতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছে তিনটি মূলনীতি। এগুলো হলো ১. ভারতবর্ষ অখণ্ড দেশ নয়– এ দেশে বহুজাতিক বসতি। ২. একক কেন্দ্রীয় শাসন এখানে চলবে না। ৩. ভারতের বিভিন্নতা মেনে নিতে হবে এবং সকলের আত্মবিকাশের সুবিধার জন্য ভারতকে কয়েকটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে হবে। ('হাবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী' ঢাকা, ১৯৭১, পৃ ১১৫।) এই যে পাকিস্তান এতো জিন্নাহ ও তাঁর পাঞ্জাবী অনুচরদের রাষ্ট্র নয়, এ হচ্ছে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেখানে শাসন এককেন্দ্রিক হবে না এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি থাকবে। ১৯৪১-এ হাবীবুল্লাহ বাহার যেন স্বপ্ন দেখেছেন ১৯৭১-এর বাংলাদেশের। ভারতবর্ষকে এক জাতির দেশ বলছেন না, দুই জাতিরও নয়, বলছেন বহুজাতিক দেশ; যেটা হচ্ছে বাস্তব সত্য। স্পষ্টতই জাতি গঠনের প্রধান উপাদান হিসেবে তিনি ধর্মকে দেখতে পাচ্ছেন না, দেখছেন ভাষাকে, অর্থাৎ মাতৃভাষাকে। ভারতবর্ষে মাতৃভাষার অবস্থান সর্বদাই পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। বাহার সেই প্রতিবাদ শুনতে পেয়েছেন। ভাষা হচ্ছে ইহজাগতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ; এবং ধর্মনিরপেক্ষতা হলো গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত। বাহারের কল্পনায় যে পাকিস্তানের ছবি ছিল সেটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই।

> বাঙালির রসিকতা পুরনো দিনের কবিতাতে যেমন আধুনিক সমাজেও তেমনি বিশেষভাবে উপাদেয় হয় যখন তা মেয়েদেরকে জড়িয়ে নেয়। নারীকে নির্দ্বিধায় 'রমণী' বলা হয়; এবং অনেকেরই বিনোদন লিপ্সা নারীকেন্দ্রিকতাকে ছাড়িয়ে এগুতে পারে না। পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্র যা ঘটে এখানেও তাই ঘটছে, মেয়েদের নিরাপত্তা এখানে কম, পুরুষের তুলনায়

১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একজন মন্ত্রী। সেই অবস্থানে থেকেই চৌদ্দই আগস্ট অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা দিবস সম্পর্কে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে বলতে আমার দ্বিধা নেই, আমরা মুসলিম তমদ্দুনের মানস-সন্তান; ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙ্গালী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।' (ঐ, পৃ ৩৯৮) ব্যাপারটি তাঁর কাছে পরিষ্কার; মুসলিম তমুদ্দুনের মানস-সন্তান, কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। প্রথমটি কল্পনার ছবি, বাস্তবে ঘটবে কি; ঘটবে না কে জানে; কিন্তু দ্বিতীয়টি অবিসংবাদিত সত্য; আমরা বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিগড় ভেঙে বের হয়ে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের এই নতুন রাষ্ট্র কি গণতান্ত্রিক হয়েছে? হয় নি। হয় নি যে তার অনেক প্রমাণের একটি হলো মাতৃভাষার অমর্যাদা। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আমরা আবার ফেরত আসবো।

উত্তরাধিকার হিসাবে সেলিনা পিতৃতান্ত্রিকতা বিরোধী পিতাকে

পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন একই আদর্শে দীক্ষিত পিতৃভগ্নি শামসুন নাহার মাহমুদকেও। বাহার ও নাহার শৈশবেই পিতৃহীন হন; বাবাকে যখন হারান তখন ভ্রাতার বয়স আড়াই বছর, ভগ্নির বয়স ছয় মাস। এঁরা মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হয়েছেন। ভাইবোনের জীবনে মা'য়ের ভূমিকা স্মরণ করতে গিয়ে শামসুন নাহার 'যে প্রদীপ দিয়েছে শুধু আলো' নামের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'শুধু মা বললে ভুল হয়, তিনি ছিলেন একাধারে আমাদের মাতা, পিতা, শিক্ষক, আমাদের বন্ধু, আমাদের সহযোগী, সহকর্মী সর্ববিষয়ে।' ('বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ স্মারকগ্রন্থ', সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০০, পৃ ২৪৭।) পরবর্তী জীবনে এই ভাইবোনকে আমরা যে মিলিত সংগ্রামে যুক্ত দেখি সেটা যে মাতৃতান্ত্রিকতার পক্ষে ছিল তা নয়, ছিল পিতৃতান্ত্রিকতার বিপক্ষে এবং প্রসারিত অর্থে গণতান্ত্রিকতার পক্ষে।

গণতান্ত্রিকতার প্রধান শত্রু হচ্ছে বৈষম্য। সেই বৈষম্য বাহার-নাহারের ক্ষেত্রে যে অনুপস্থিত ছিল সেটা বলা যাবে না। ভাই যতটা স্বাধীনতা পেয়েছেন, বোন ততটা পান নি; প্রশ্নই ওঠেনি পাবার। অন্যত্র শামসুন নাহার স্মরণ করেছেন ক্লাস সিক্সে পড়তে পড়তেই তাগিদ শুরু হয়েছিল পর্দার, এবং ক্লাস সেভেনের চৌকাঠ পার হবার পর আর স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কৌতুকের সুরে বলেছেন–

> *প্রাইভেট পড়ে ম্যাট্রিকের জন্য তৈরি হলাম ১৯২৬ সালে। বাড়ীতে পড়াতেন যে বুড়ো মাস্টার– পড়বার সময় তাঁর আর আমার মাঝখানে ঝুলতো এক বিরাট পর্দা– চার হাত চওড়া আর আট হাত লম্বা। তার তলা দিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রীর বইপত্র আদান-প্রদান চলত ঠিকই; কিন্তু পর্দার এপার থেকে ওপারে পড়া বোঝানো আর এলজেবরা জিওমেট্রি কষানো চলত কি করে তা সত্যি ভাববার বিষয়। (ঐ, পৃ ২৫৬)*

শামসুন নাহার মাহমুদের প্রথম বই 'পুণ্যবতী'র জন্য কয়েক ছত্রের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম, তাতে বলা হয়েছে, 'তব গৃহ নহে অন্ধকূপ'। তা শামসুন নাহারের জন্য তাঁর গৃহ একটি অন্ধকূপ হতে পারতো বৈকি; অনেক, বলা যায় অধিকাংশ গৃহই তা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমনটি যে ঘটেনি তার কারণ শুধু ব্যক্তিগত মেধা নয়, সঙ্গে ছিল মাতৃযত্ন, এবং ছিল ভাইবোনের সহযোগিতা, আরো পরে স্বামীর সমর্থন। নইলে পিতৃতান্ত্রিকতার বিজয়টা ছিল অবশ্যম্ভাবী।

বাহার-নাহার হাত ধরাধরি করে বড় হয়েছেন। নজরুল যে তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, 'কে তোমাদের ভালো? বাহার আনে গুলশানে গুল/নাহার আনে আলো' এবং 'তোমরা দু'টি ফুলের দুলাল/আলোর দুলালী/ একটি বোঁটায় ফুটল এসে নয়ন ভুলালি', সেই সঙ্গে 'তোমাদের মাঝে আকাশ-ধরা করছে কানাকানি', সে-উক্তিতে কাব্য অবশ্যই আছে কিন্তু সত্যের যে অভাব আছে তা তো নয়।

ভাইবোন মিলে অন্ধকূপের গ্রাস থেকে বের হবার চমৎকার এক ছবি শামসুন নাহার তাঁর রচিত 'রোকেয়া-জীবনী'তে এঁকেছেন। 'ভাইবোন' শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সাবের কনিষ্ঠ ভগ্নি রোকেয়াকে কীভাবে সাহায্য করছেন তার কাহিনী–

> *পিতা বাংলা বা ইংরেজির ঘোর-বিরোধী। দিনের বেলা সকল সময় পড়াশোনার সুযোগ হয় না। ভ্রাতাভগ্নি অপেক্ষায় থাকেন কখন দিন গিয়া রাত্রি আসিবে। খাওয়া-দাওয়ার পর পিতা শুইতে গেলে দু'ভাইবোন বসেন পুঁথিপত্র লইয়া। গভীর রাত্রে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় যায় আর সেই সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে দু'টি কিশোর-কিশোরীর শয়ন কক্ষে স্তিমিত দীপ শিখা। চোখ মুছিয়া সেই নীরব নিশীথে দু'ভাইবোন মোমবাতির পাশে বসেন। জ্ঞান দান করেন ভাই আর বালিকা ভগ্নি সেই জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করেন।*

এ তো বিদ্রোহ বটে, নীরব বিদ্রোহ, পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহকে রোকেয়া পরে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন– শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে কিছুটা, অনেক বেশি মাত্রায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে; তাঁর প্রায় সকল প্রবন্ধই এবং কল্পনাধর্মী লেখা– 'সুলতানার স্বপ্ন' এবং 'পদ্মরাগ' পিতৃতান্ত্রিকতার সামান্যতাকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। বেগম রোকেয়া এমন কথাও বলেছেন যে, ধর্মগ্রন্থগুলো নিশ্চয়ই পুরুষের রচনা, নইলে সেখানে পরকালে পুরুষের জন্যই শুধু স্বর্গ সুখের বিবরণ থাকবে কেন, মেয়েরা কী পাবে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে?

অত্যন্ত মেধাবান হলেও ভাইবোনের মধ্যে পার্থক্যটা থাকে, এমনকি কর্মক্ষেত্রে যদি একই রকমের হয় তবুও। যেমন ধরা যাক বাংলারই দুই ভাইবোন সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯–১৯৪৯) এবং ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৮০–১৯৪৩) কথা। এঁরা উভয়েই ইউরোপে গেছেন অল্প বয়সে, দুই জনেই ছিলেন উচ্চ মেধাসম্পন্ন। তাঁরা রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্র ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সরোজিনী ছিলেন গান্ধীপন্থী; ধীরেন্দ্রনাথ একেবারে উল্টো দিকের; তিনি মার্কসবাদী ছিলেন এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখতেন। বিলেতে গিয়ে তিনি আইসিএস পরীক্ষা দেননি, ব্যারিস্টার হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার ধরন লক্ষ্য করে যে-মিডল টেম্পল তাঁকে সনদ দিয়েছিল তারা সেই সনদ কেড়ে নিয়েছিল ১৯০৯ সালে। ধীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি, কেননা তিনি সফল হননি; কিন্তু সরোজিনী নাইডুর তুলনায় তাঁর কর্মক্ষেত্র ও অঙ্গীকার যে অনেক বড় ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বযুদ্ধের সুযোগকে ব্যবহার করে ১৯৭১ সালে লেনিন যখন তাঁর দেশে বিপ্লব সংগঠিত করছেন ধীরেন্দ্রনাথও তখন জার্মানদের সাহায্যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গড়ে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা তাঁর পরিবারের জন্য তো অবশ্যই, সরোজিনীর জন্যও বিশেষভাবেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ধীরেন্দ্রনাথের মতো বড় মাপের স্বপ্নকে লালন করা তাঁর ভগ্নির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, যার একটি কারণ ভগ্নির ভগ্নিত্ব। ওদিকে আবার এটাও সত্য যে, ধীরেন্দ্রনাথের সাফল্য যে দৃষ্টিগোচর নয় তার মূল কারণ তিনি লড়ছিলেন পিতৃতান্ত্রিকতার (এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের) উচ্ছেদের জন্য, আর সরোজিনীর লড়াইটা ছিল ব্রিটিশ পিতৃতন্ত্রের জায়গায় ভারতীয় পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। উচ্ছেদ অনেক কঠিন প্রতিস্থাপনের তুলনায়।

২.

কোনো উপমাই যথার্থ নয়, উপমা যুক্তিও নয়, অনেক সময় যুক্তিকে অস্পষ্ট করার জন্য সে দায়ী হয়, তবু এরকম হয়তো বলা যায় যে, আমাদের এই উপমহাদেশে সমাজকে মনে হয়েছে মায়ের মতো, আর রাষ্ট্র যেন পিতা। সমাজ স্থানীয়, রাষ্ট্র বহিরাগত; সমাজের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকে লালন পালনের, আর রাষ্ট্র ভয় দেখায় শাসন-শোষণের। কিন্তু এই তুলনাকে যে বেশি দূর এগিয়ে নেওয়া যাবে তার উপায় নেই। কেননা সমাজও পীড়ন করে বটে; দুর্বলের জন্য যে সংহারক হয়ে ওঠে, যেমন সে অজ্ঞাবহ থাকে প্রবলের। আমাদের সাহিত্যে এই বাস্তবতার ছবি নানাভাবে এসেছে। আসল সত্যটা হলো অগণতান্ত্রিকতা, যা সমাজে থাকে, রাষ্ট্রেও থাকে। সমাজ থেকে যেমন রাষ্ট্রে যায়, তেমনি রাষ্ট্র থেকে সমাজে আসে। রাষ্ট্র অগণতান্ত্রিকতার প্রতিভূ ও পাহারাদার হয়ে ওঠে; কিন্তু পেছনে প্রয়োজনটা থাকে সামাজিক। সমাজে বিদ্যমান যে বৈষম্য রাষ্ট্র তাকেই ধারণ, সংরক্ষণ ও বিকশিত করে। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিকতা নেই বলে রাষ্ট্র তো অবশ্যই, সমাজও পিতৃতান্ত্রিক। বোধ করি স্মরণ করা আবশ্যক যে, গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বৈষম্য নিরসন, এবং অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা।

পিতার প্রয়োজন আছে। এবং সত্য এটাও যে, ব্যক্তি পিতা যত ব্যর্থ হন আদর্শ হিসেবে পিতৃতান্ত্রিকতা তত প্রবল হয়। এর প্রধান কারণ পিতার ওই প্রয়োজনীয়তা। আমাদের সমাজে পিতারা ব্যর্থ হয়েছেন। রাষ্ট্রে ছিল বিদেশীদের কর্তৃত্ব, সমাজের ভেতর বড় মাপের মানুষ যাঁরা, যাঁদের অনেকেই প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁরা নত হয়েছেন শাসকদের কাছে। এটা বিশেষ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে ব্রিটিশ শাসনে। বড় মানুষেরা প্রচারও করেছেন অবনত অবস্থায় আত্মোন্নতির তত্ত্ব। রাষ্ট্র ঘিরে ফেলেছে সমাজকে; তার আইন, বাহিনী, যোগাযোগ এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। যাকে আত্মসর্বস্বতা বলে শনাক্ত করি, সে-ব্যাপারটা যতটা না মাতৃসুলভ, তার চেয়ে অধিক পিতৃতান্ত্রিক। শিক্ষার ব্যাপারটা বিশেষভাবে দুঃখজনক। কেননা শিক্ষা আমাদেরকে যতটা না সামাজিক করেছে সেই তুলনায় অনেক অধিক পরিমাণে করেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

ব্রিটিশের শাসনাধীনে বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার পেছনে প্রেরণাটা ছিল চাকরি পাবার। কলকাতাতে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য শিক্ষাদান ছিল না, ছিল ডিগ্রিদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলর অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্নর পরিহাস করে বলেছিলেন, "So many young Bengalis when asked what they want to do in life say 'service'; an admirable reply if by

service is meant sheba and not chakori. (Dhaka University Comvaction Speeches, vol 1, 1988, p 261) ঘটনাটা তো মিথা নয়, service চায়, সেবা করতে চায়, তবে সমাজের সেবা নয় প্রভুর সেবা; যে-প্রভু সেকালে ছিল রাষ্ট্র, একালে প্রভুত্বের বৃত্ত প্রসারিত হয়েছে, কেননা, নিয়োগকারী হিসেবে রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ ঘটেছে নানা ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের।

রাষ্ট্র বদল হয়েছে, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতার পতন হয়। উপমহাদেশে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে মহিলারা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত চরিত্রে কোনো প্রকার ইতরবিশেষ ঘটেনি; এবং নারী প্রধানমন্ত্রীরাও ঠিক সেভাবেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তাঁদের আগে ও পরে পুরুষ প্রধানমন্ত্রীরা যেভাবে করে গেছেন। রাষ্ট্র বদলের অর্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দাঁড়ায় নি, দাঁড়িয়েছে ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্র।

এ পর্যায়ে আমরা উপমহাদেশে ব্রিটিশদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিতে পারি। এ আন্দোলন বিশেষভাবে প্রবল হয়েছে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে। তখন মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির পক্ষে সন্তানেরা রুখে দাঁড়িয়েছে। আন্দোলনের বিশেষ রণধ্বনি ছিল 'বন্দেমাতরম'। এতে মা আছেন, কিন্তু তিনি মুখ্য নন, মুখ্য হচ্ছে মাতার সন্তান, পুত্র সন্তান, ব্যথায় যারা বিদীর্ণ হয়েছে মাতার দুর্দশা দেখে, এবং প্রতিজ্ঞা করেছে, যেকোনো মূল্যেই হোক মা'কে তারা মুক্ত করবেই। এই সন্তানেরা ভীষণভাবে পিতৃতান্ত্রিক, তাদের প্রতিজ্ঞা পিতাদের ব্যর্থতার দুঃসাহসী ক্ষতিপূরণের। কিন্তু মাতাকে মুক্ত

> **পিতৃতন্ত্র সামাজিক অগ্রগতিকে আটকে দেয়। সেলিনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুবিধা ছিল যে তাঁর পিতা হাবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন উদারহৃদয় ও গণতান্ত্রিক। মুসলিম লীগের রাজনীতি এক সময়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল, সেই টানে হাবীবুল্লাহ বাহারের মতো অনেক প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার মানুষও সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু এঁরা, বিশেষভাবে হাবীবুল্লাহ বাহার সেখানে স্বস্তিবোধ করেননি। তাঁর ওপর কত প্রচন্ড স্নায়বিক চাপ যে পড়েছিল সেটা টের পাওয়া যায় সেই ১৯৫৩ সালেই মন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায়**

করতে গিয়েই নতুন বিপদ তৈরি হলো, সাম্প্রদায়িকতা চলে এলো। মুসলমানের কাছে মাতৃভূমির দেবীমূর্তি গ্রহণযোগ্য হলো না, এবং ক্রমে তাদের দিক থেকে পাল্টা রণধ্বনি উচ্চারিত হলো 'আল্লাহু আকবরে'র।

রবীন্দ্রনাথের লেখা স্বদেশী গানগুলোর সঙ্গে 'বন্দেমাতরম'-এর তুলনা করলে পার্থক্যটা খুব সহজেই ধরা পড়ে, এবং বোঝা যায় কেন 'বন্দেমাতরম'কে মুসলমান সম্প্রদায় গ্রহণ করতে অপারগ হয়েছে। ধরা যাক, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটির কথা, যেটি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এতে যে মা'য়ের কথা হয়েছে তিনি কোনো দেবী নন, শুধুই দেশ। এই দেশ ধর্মনিরপেক্ষ এবং সে কারণে গণতান্ত্রিক হবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, এবং ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছেই আদরণীয়। এমনকি পরবর্তীকালে রচিত 'জনগণমন অধিনায়ক হে ভারতভাগ্যবিধাতা' গানটিতেও, যেটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে সেখানেও কোনো ধর্মীয় বিধাতার কথা বলা হয় নি, যে-বিধাতার উল্লেখ আছে তিনি সবার, সকল ভারতবাসীর। এবং এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই ভারতবিধাতা পিতার মতো কর্তৃত্বপরায়ণ নন, তিনি মাতার মতো স্নেহশীল, সে জন্য গ্রহণযোগ্য।

স্বদেশী আন্দোলনে দেশপ্রেম, বিদ্রোহ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা সবকিছুই ছিল, কিন্তু ওই আন্দোলনের ফলে যা বিশেষভাবে আঘাত পেলো তা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহাসিক পরাজয়ের সূচনা ওইখান থেকেই। পিতৃতান্ত্রিক ব্রিটিশ রাজের অভিসন্ধি ছিল বাংলাকে দুই প্রদেশে ভাগ করে ব্রিটিশবিরোধিতাকে দুর্বল করবে; প্রদেশ বিভাজনে তারা সফল হলো না ঠিকই, কিন্তু পরোক্ষে আরো গভীর, ব্যাপক ও ক্ষতিকর এক বিভক্তি এনে দিতে সক্ষম হলো সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রূপ নিলো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের, এবং যার পরিণতিতে ভাগ হয়ে গেলো দেশ। আর সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি প্রোথিত রয়ে গেলো উভয় রাষ্ট্রেই। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচনের প্রবর্তন, তারপরে ধাপে ধাপে শাসন সংস্কার ও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যা বিশেষভাবে বিকশিত হলো তা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্য নয়, বরঞ্চ সাম্প্রদায়িক বিভেদ।

ভাইরা চেষ্টা করেছে এক হতে, কিন্তু পারেনি, সাম্প্রদায়িকতার কারণে। বোনেরাও ছিল, রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা অংশও নিয়েছে, কিন্তু একেবারে যে সামনে আসবে তা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি মনে পড়ে, 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে/ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে', এবং 'কতদিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে/ আজ ঘরের ছেড়ে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয়রে মা'কে।' এই ডাকে ভাইয়েরা সাড়া দিয়েছে, বোনেরাও দিয়েছে সাধ্যমত। কোথাও কোথাও অরন্ধন ব্রত পালিত হয়েছে; কিন্তু বোনেরা তেমন উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

ছয় দশক পরে ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববঙ্গের মানুষকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে। তাতে তিনি উপস্থিত বিপুলসংখ্যক মানুষকে সম্বোধন করেন 'ভায়েরা আমার' বলে, যদিও সভাতে বহু মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। ভাইদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এবং শেখ মুজিবের, উভয়ের ডাকেই বোনরা যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না তা নয়, বোনদেরকেও ভাই বলার রীতি অপ্রচলিত নয়, তবু ভাই আর বোনে পার্থক্যটা তো থাকেই, এবং সংগ্রামের প্রস্তুতির আবেগের মুহূর্তে বোনদের কথা মনে না পড়াটা যে একেবারেই তাৎপর্যহীন তা বোধ করি নয়।

নজরুলের 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটিতে কিন্তু ঘটনা দেখি অন্যপ্রকারের। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে কবি বলছেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।' এখানে ভাই বোন আলাদা থাকার বা হবার প্রশ্ন নেই। সকলেই মায়ের সন্তান; সাম্য ও ঐক্যের ওই বোধটি থাকলে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ জ্ঞানও অবলুপ্ত হয়, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ঘটে না।

স্বদেশী আন্দোলনের সামগ্রিক চেহারাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল পিতৃতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পিতৃতান্ত্রিক দেশপ্রেমিকদের বিদ্রোহের। কেননা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়ছিলেন তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ তো ছিলেনই না বরঞ্চ ধর্মকে ব্যবহার করছিলেন অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হিসাবে। পিতৃতান্ত্রিক সামন্তবাদের সঙ্গে তাঁদের যে কোনো বিরোধ ছিল তাও নয়। আমরা দেখি যে আন্দোলনের নেতাদের অনেকেই নিজেদেরকে দেখেছেন ঈশ্বরের হাতে যন্ত্র হিসাবে, যে ঈশ্বর মাতার মতো নন, পিতার মতোই। অরবিন্দ থেকে শুরু করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পর্যন্ত সকলেই নিজেদেরকে ওই ভাবে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। এমনকি, অনেক পরে, এবং বহু ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ নজরুলও তাঁর বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে নিজেকে ভগবানের হাতের বীণা বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, রামপ্রসাদের গানে যে আছে, 'তোমার কাজ তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি', সেখানকার মা'কে মা না বলে পিতা বলাই সঙ্গত। পিতাই হচ্ছেন যন্ত্রী, অন্যরা যন্ত্র। বাংলার ধর্মবাদিতা এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। সবকিছু তো তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটে এবং ঘটে চলেছে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের দুই নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু উভয়ের ভেতর ঐক্য ছিল এক ব্যাপারে– পিতৃতান্ত্রিকতায়। বচনে, আচরণে, মায়া-মমতায়, জনগণের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায়, পোশাকে

পরিচ্ছদে গান্ধীকে মনে হবে মাতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি। তিনি কখনো উগ্র নন, সর্বদাই অহিংসার নীতি অনুসরণ করেন, তাঁর সত্যাগ্রহ পরিণত হয় আত্মশুদ্ধিতে। খাদ্য-অখাদ্যের ব্যাপারে তিনি বাছবিচার করেন। সমাজকে ভালোবাসেন মাতার হৃদয় দিয়ে। তিনি সকলকে ধারণ করতে চান তাঁর রাজনীতিতে। রাজনৈতিক বক্তৃতাতেও তিনি উচ্চকণ্ঠ নন, তাঁর রাজনীতির সভা এসে দাঁড়ায় প্রার্থনা সভায়। এসবই সত্য।

কিন্তু ভেতরে যে মানুষটি রয়েছেন তিনি অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক। গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তিনি একাই নিতেন। ১৯১৯ সালে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগদানের পর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন একচ্ছত্র। ১৯৩১-এর গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীকে নিজেকে মনোনীত করেছিলেন একমাত্র মুখপাত্ররূপে; ১৯৪০-এ নিজেকে তুলনা করেছেন একজন সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এবং অনুসারীদেরকে বলেছেন সৈন্যদের মতো জিজ্ঞাসাবিহীন আচরণ করতে। অন্যদের মতের চাইতে তিনি অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করতেন নিজের অন্তর্গত কণ্ঠস্বরকে, অনেক সময় পথনির্দেশ পেতেন স্বপ্নে, এবং সেই নির্দেশ কার্যকর করা হতো অনুসারীদের মাধ্যমে। গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছেন 'My Story of Experiments with Truth.' কিন্তু তিনি তো বিজ্ঞানী নন, রাজনীতিক, এবং তাঁর যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেটা তো কোনো ল্যাবরেটরিতে নয় জনগণকে নিয়েই; সত্যের ব্যক্তিগত উন্মোচনের জন্য জনগণকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করার কাজটা যতটা না মাতৃসুলভ তার চেয়ে বেশি পিতৃসুলভ বৈকি।

রাজনীতিতে তিনি মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না, যদিও সর্বদাই ছিলেন সুনিশ্চিত রূপে অসাম্প্রদায়িক। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে দেবার এই ঘটনা যে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেনি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি যে ঈশ্বরের কথা বলতেন তাঁর নাম ভগবান বটে আল্লাহও বটে; কিন্তু ওই ঈশ্বর অবশ্যই পিতার মতো, এবং গান্ধী নিজেকে বলেছেন ভগবানের হাতে যন্ত্র। নিজে তিনি 'মহাত্মা' ছিলেন, আবার ছিলেন 'বাপুজী'ও; নেহরুসহ নিকটজনরা তাঁকে ওই দ্বিতীয় নামেই সম্বোধন করতেন, তিনি নিজেও আন্তরিক চিঠিতে অনেক সময় নিজের নাম লিখতেন বাপু বলে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গান্ধী ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তারা টিকতে পারেন নি; জিন্নাহকে তাই কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছে, চিত্তরঞ্জন স্বরাজ পার্টি গঠন করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। নেহরু গান্ধীর অনেক নীতিই পছন্দ করতেন না, কিন্তু গান্ধীকে ছেড়ে যেতে পারেননি, আপোস করে চলতে হয়েছে এবং গান্ধী নেহরুকে নিজের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। শুধু সুভাষ বসুই বিদ্রোহ করেছেন, যার পরিণতিতে তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে।

গান্ধীকে 'জাতির পিতা' উপাধি দেওয়া হয়েছিল এবং এটা অবশ্যই তাৎপর্যহীন নয়, যে সেটি আর কেউ দেন নি, দিয়েছেন স্বয়ং সুভাষ চন্দ্র বসু। ১৯৪৪-এর ২ অক্টোবর তারিখে গান্ধীর ৭৫তম জন্মদিবসে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের প্রধান হিসাবে রেঙ্গুনে পতাকা উত্তোলন করে সুভাষ ঘোষণা করেন, "Father of Our nation! In this holy war of India's Liberation we ask for your blessing." (J.B. Kripalini, Gandhi, His Life and Thought, New Delhi, 1990, p 222)। পিতার সাহায্য দরকার হয় বৈকি, আর তিনি যদি হন মহাত্মা গান্ধী।

কিন্তু গান্ধী নিজে পিতৃতান্ত্রিক এটা যেমন সত্য, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সত্য হলো এই সত্য যে, তিনি পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে গণতান্ত্রিক করার বিষয়ে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বটাই তাঁর জন্য মুখ্য ছিল; কিন্তু তিনি যে স্বরাজ চাইছিলেন তা রাষ্ট্রকাঠামোকে বদলে দেবে এটা ভাবেননি। প্রথম দিকে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসেই সন্তুষ্ট ছিলেন, শেষ পর্যন্তও ওই স্ট্যাটাসকেই মেনে নিয়েছেন। ভারতবর্ষকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন, এবং ভারতবর্ষকে এক জাতির দেশ মনে করতেন, যে এক জাতিত্বের ধারণার ভিত্তি হিসাবে ধর্ম এসে যেতো, অনিবার্য ভাবেই।

গান্ধী রাষ্ট্রের চাইতে সমাজকে বড় মনে করতেন; কিন্তু সমাজে বিদ্যমান অগণতান্ত্রিকতার নিরসন চাননি, চেয়েছেন অস্পৃশ্যতার মতো ব্যাধির নিবারণ এবং চরকা ও খাদির প্রচলন দিয়ে স্বাবলম্বনের সৃষ্টি। আর তিনি কখনোই রাজনীতিকে ত্যাগ করেননি। কেননা জানতেন রাজনীতির বাইরে গেলে তাঁর কাজ গুরুত্ব হারাবে, এবং তিনি মুখপাত্র থাকবেন না সমগ্র ভারতের যেটা তিনি সর্বদাই থাকতে চেয়েছেন।

তাঁর পাশে জিন্নাহকে দাঁড় করালে অবশ্য নির্জলা পিতৃতান্ত্রিকতা কাকে বলে তা বোঝা যায়। জিন্নাহ আগাগোড়াই অনমনীয় এবং একক। তিনি একাধারে জাতির পিতা এবং কায়েদে আজম, শ্রেষ্ঠ নেতা। শুরুতে কংগ্রেসে ছিলেন, সেখানে গান্ধীকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিনতে পেরে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কেবল কংগ্রেস নয়, রাজনীতিই ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন; তারপর ফিরে এলেন, মুসলিম লীগের সর্বেসর্বা ও স্থায়ী সভাপতি হয়ে। যে রাষ্ট্র তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তার সম্পর্কে তাঁর নিজের কাছেই নানাবিধ অস্পষ্টতা ছিল এটা সত্য, কিন্তু একটি ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। সেটা এই যে, ওই রাষ্ট্র হবে পুঁজিবাদী ও এককেন্দ্রিক অর্থাৎ পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক।

সমাজ সংস্কারে জিন্নাহর বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ পায়নি, তার চোখ সর্বদাই নিবদ্ধ ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার দিকে, যে জন্য তিনি ছোট হোক বড় হোক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, যার তিনি একচ্ছত্র নায়ক হতে পারবেন। এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছিলেন, ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট তিনি একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি, গণপরিষদের সভাপতি এবং মুসলিম লীগের প্রধান। রাষ্ট্র পেয়ে তিনি মুসলিম লীগ ভিন্ন অন্য কোনো দল দরকার নেই এমন ঘোষণা দিলেন কোয়েটার এক জনসভায়, আর ঢাকায় এসে বলে গেলেন শতকরা ৫৬ জন নাগরিকের ভাষা নয়, নিতান্ত অল্প-সংখ্যক (কেউ বলেন শতকরা ৫ জন) নাগরিকের ভাষা উর্দুই হবে রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

জিন্নাহর জন্য চালিকাশক্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এ, কে ফজলুল হকের ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে, তিনি তাঁকে কোণঠাসা করেছেন। যদিও লাহোর প্রস্তাবের মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিতকর হতো যদি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে সেটি উত্থাপন করানো না যেতো। এমনকি খাজা নাজিমুদ্দিনকেও তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জন্য মনোনীত করেন নি, খুঁজে বেছে বের করেছিলেন অত্যন্ত নিরীহ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। সোহরাওয়ার্দীকে তিনি লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে স্থান দেন নি, যদিও তাঁকে ব্যবহার করেছেন লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের ধারণাকে সাংগঠনিক বৈধতা দেবার কারসাজিতে। লিয়াকত আলী খান যে টিকে গেছেন সেটা সম্ভব হয়েছে নবাবজাদার নিজের ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত করে দেবার মধ্য দিয়ে।

জিন্নাহও একক মুখপাত্র ছিলেন– মুসলিম লীগের তো অবশ্যই সকল ভারতীয় মুসলিমেরই। জেদ ও আপসবিমুখতা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। গান্ধীকে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি অপছন্দ করতেন তিনি মওলানা আবুল কালাম আজাদকে, কেননা গান্ধী ছিলেন শত্রু, আজাদ ছিলেন 'বিশ্বাসঘাতক', মুসলমান হয়েও জিন্নাহ-অনুসারী না-হওয়ার কারণে। নিজের ইচ্ছাকে তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতেন, যার জোরে ৪২ বছর বয়সে ১৮ বছরের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পাত্রীকে পাত্রীর পরিবারের অমতে এবং ধর্মান্তরিত করিয়ে নিয়ে তিনি বিবাহ করেন। বলা বাহুল্য, সে-বিয়ে কোনো পক্ষের জন্যই সুখের হয়নি; বিয়ের দশ বছর পরে রতনবাঈ মারা যান; ওদিকে একমাত্র কন্যাকে জিন্নাহ ত্যাজ্য করে দিয়েছিলেন তাঁর অমতে বিয়ে করার জন্য।

ব্যক্তিগত জীবনাচারে ধর্মের সঙ্গে জিন্নাহর কোনো সম্পর্ক ছিল না, গান্ধী থেকে তিনি এক্ষেত্রে একেবারেই ভিন্নধর্মী, প্রথম জীবনের রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান ছিল পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু পরে মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপাত্র হয়ে গেলেন এবং এমন একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন যার পরিচয় দাঁড়াল ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে।

বেশভূষা, বক্তৃতার ভঙ্গি ও ভাষা, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই তিনি প্রকাশ্যতই পিতৃতান্ত্রিক। কিন্তু তথাকথিত জাতির পিতা হিসাবে তিনি আবার ব্যর্থও। তাঁর জাতি এক হয় নি, এক করার চেষ্টাতেই বরঞ্চ ভেঙে গেছে, বাঙালি মুসলমান আলাদা হয়ে গেছে, সিন্ধী, পাঠান ও মোহাজেররা অস্থির হয়ে রয়েছে, খণ্ডিত পাকিস্তান যে এখনো টিকে আছে সেটা সেনাশাসনের জোরে, যে সেনাশাসনের নির্গলিতার্থ নির্জলা পাঞ্জাবি শাসন ভিন্ন অন্যকিছু নয়। এবং ইতিহাসের চরম কৌতুক এইখানে যে, যে-মুসলিম সম্প্রদায়কে তিনি মুক্তি দেবেন বলেছিলেন তাদের বিরাট অংশকে, অর্ধেকের কাছাকাছিকে, ধর্মনিরপেক্ষ ভাবতে ফেলে রেখে তিনি

চলে এসেছেন। জাতির পিতার পক্ষে সে এক ঐতিহাসিক পশ্চাদাপসরণ বটে। যাঁদেরকে তিনি ফেলে রেখে এলেন তাদের জন্য ভরসাস্থল তিনি হন নি, হয়েছিলেন তাঁর শত্রু গান্ধী; মুসলিমস্বার্থ রক্ষা করছেন এই অভিযোগে যাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে হিন্দু ধর্মান্ধদের হাতে। ভারতে পরিত্যক্ত সেই মুসলমানরা এগুবেন কি, নেতৃত্ব বঞ্চিত হয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে গেছেন, এবং সর্বসাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে শিক্ষা ও সম্পত্তির নিরিখে তাদের অবস্থান এখন ভারতীয় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভেতর সর্বনিম্নে।

সুভাষ বসুর অবস্থান ভিন্ন রকমের। তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতায় পিতৃতান্ত্রিকতার স্থান ছিল না। তিনি ছিলেন অঙ্গীকারবদ্ধ গণতন্ত্রী। স্বাধীন ভারতবর্ষকে যে সমাজতন্ত্রী হতে হবে এ বিষয়ে তিনি কোনো সংশয়ের প্রশ্রয় দিতেন না। কেবল অসাম্প্রদায়িক নয়, সুভাষ ছিলেন পরিপূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ; যে জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীত করে নি, 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' উদ্ভাবন করেছিল। সম্ভাষণের ক্ষেত্রে হিন্দুর নমস্কার মুসলমানের সালাম এবং শিখের সৎ শ্রী আকালের জায়গায় সুভাষ 'জয় হিন্দ'-এর প্রবর্তন করেছিলেন; যে-ঐতিহ্য পরে 'জিয়ে সিন্ধ' এবং 'জয় বাংলা' পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। সুভাষ তাঁর বাহিনীতে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে সেটিও কম কথা নয়। ব্যক্তিগত ব্যবহারে সুভাষ নিজেও ছিলেন মেয়েদের মতো কোমল, যদিও রাজনীতিতে অত্যন্ত অনমনীয়।

কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতা তাঁকেও রেহাই দেয়নি। গান্ধীকে জাতির পিতার আসনে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগের বিষয়ে আমরা উল্লেখ করেছি; ওদিকে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে একটি কন্যা সন্তানের পিতা ছিলেন সেই সত্যকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন নি। ইউরোপে থাকতে সুভাষ যে এমিলি সেঙ্কেল নামে এক বিদেশিনীকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁদের যে একটি সন্তান আছে এ খবর তিনি তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় বসু পরিবার তা প্রকাশ করে নি। পরে ভারত সরকার এমিলি ও তাঁর সন্তানের ব্যাপারে কিছুটা উৎসাহ দেখিয়েছিল; কিন্তু কংগ্রেসের মূল অভিপ্রায়টা তাঁদেরকে সম্মানিত করা ছিল না, ছিল সুভাষকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে শেখ মুজিবুর রহমান এক সময়ে সকলের কাছেই 'মুজিব ভাই' ছিলেন; এটা সেই সময় যখন তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষকে স্বাধীনতামুখী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পরে তাঁর অনুসারীরা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিলেন। কিন্তু সেখানেই তাঁরা থেমে থাকেন নি, আরো এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জাতির জনক আখ্যা দেন। এর প্রয়োজন ছিল না। প্রথমত, তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং বাঙালির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে কাজটি সম্পন্ন করে গেছেন তাতে ইতিহাসে তাঁর স্থান অনন্য বলে সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে জন্মগ্রহণ করে নি, তার জাতিগত ইতিহাস প্রাচীন বটে।

কিন্তু ওই যে ভাইকে পিতার আসন দেওয়া এটি অন্যদের জন্য কতটা সুবিধাজনক হয়েছে সে-বিচার ভিন্ন, শেখ মুজিবের নিজের জন্য যে উপকারী হয় নি তা ঠিক। এক কথায় বলতে গেলে এই স্থানান্তর তাঁকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে; যে বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে পঁচাত্তরের কাপুরুষ ঘাতকেরা সেই অকল্পনীয় কাজটি করতে সাহস পেয়েছে যা করবার মতো বুকের পাটা ঘাতকশ্রেষ্ঠ ইয়াহিয়া খানেরও ছিল না।

পেছনে ফিরে তাকালে এটাও দেখবো উপমহাদেশে জাতির পিতারা নিরাপদে থাকেন নি। গান্ধী ও মুজিব উভয়েই প্রাণ হারিয়েছেন ঘাতকের গুলিতে, জিন্নাহ মারা গেছেন অবিশ্বাস্য রকমের রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞার মধ্যে। পিতৃতান্ত্রিকতা সর্বত্রব্যাপ্ত বলেই হয়তো বা পিতারা তাঁদের যোগ্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন– পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে।

বাইরে থেকে দেখলে অন্যদের তুলনায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মনে হবে বেশ পিতৃতান্ত্রিক। সংগঠনের ভেতর তিনিই থাকতেন প্রধান; দলের সঙ্গে বনিবনা না হলে ছেড়ে দিয়ে নতুন দল গড়তেন; 'খামোস' বলে প্রচণ্ড স্বরে ধমক দেবার ক্ষমতা কেবল তাঁরই ছিল; কারো কারো কাছে 'পীর'ও ছিলেন; অনেকেই তাঁকে হুজুর বলতো। মোটেই তিনি গান্ধীবাদী ছিলেন না, অহিংসা তাঁর পথ নয়, মিল ছিল বরঞ্চ সুভাষের সঙ্গে। তাঁকে যুক্ত করে দেখা হয় জ্বালাও পোড়াও নীতির সঙ্গে, বলা হয় তিনি সহিংসতার দূত। কিন্তু ভেতরে তিনি ছিলেন মায়ের মতো কোমল ও স্নেহপরায়ণ। কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতী, রিকশাচালক সকলের সঙ্গে ছিল তার নিবিড় সম্পর্ক। তাদের দুঃখ ও অভাব-অভিযোগকে সাংগঠনিকভাবে ধারণ করতেন। তাঁকে গরিব করে রাখতে তাঁর অনুরাগীদের কোনো অর্থব্যয় হতো না, তাঁর জীবনযাপন স্বাভাবিকভাবেই ছিল অতিসাধারণ।

মওলানা স্বপ্ন দেখতেন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের। নিজে ধার্মিক হলেও রাজনীতিতে তিনি কেবল অসাম্প্রদায়িক নন, ছিলেন পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ। রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহন নয়, এমনকি সে-ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাও নয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রকে জনগণের করতলগত করানো। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে তিনি যেভাবে চিনেছিলেন উপমহাদেশের কোনো অ-কমিউনিস্ট নেতাই সেভাবে চিনতে পারে নি।

মওলানার পিতৃতান্ত্রিকতাবিরোধী রাজনৈতিক চরিত্র বড়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি পিতৃতান্ত্রিক জিন্নাহর সঙ্গে তাঁর তুলনা করি। জিন্নাহ এবং ভাসানী উভয়েই পাকিস্তান আন্দোলনে ছিলেন, কিন্তু দুজনের পাকিস্তান যে মোটেই এক রকমের হবে না, উপায় ছিল না হবার, সেটা আন্দোলনের কালেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এর কারণ হলো দুজন ছিলেন দুই পৃথিবীর মানুষ। ১৯৪৬-এ জিন্নাহ আসামে আসেন, মওলানা তখন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। দুজনের ভেতর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে হাসান ইস্পাহানীর লেখা বইতে। সিলেটে এসে মওলানা জিন্নাহকে আসামের কোনো কোনো এলাকায় মুসলমানরা কেমন বিপদের ভেতর আছেন তার বিবরণ দিয়েছিলেন। মওলানার দু'চোখভরা ছিল অশ্রু। ইস্পাহানী বলছেন, মওলানার কথা শুনে ইস্পাহানীর পক্ষে অশ্রু সম্বরণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। নৈশ আহারের পরে ইস্পাহানী ভাসানীর প্রসঙ্গ তুলে জিন্নাহকে বলেছিলেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওই সভাপতির মতো কর্মঠ ও উৎসাহী, নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের পরিবর্তে সমষ্টিগত দুর্দশা নিরসনের জন্য আত্মত্যাগে-উন্মুখ সভাপতিদের পেলে মুসলিম লীগ অনেক বেশি শক্তিশালী ও সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হবে। জিন্নাহ জানালেন যে তাঁর মতে নেতা হবার জন্য ভাসানী মোটেই উপযুক্ত নন। ভাসানীকে নাকচ করে দিয়ে জিন্নাহ আরো বললেন, "Politics, my boy, is a game of chess;'' সেই সঙ্গে যোগ করলেন এই মন্তব্য যে, তিনি "did not consider the Maulana fit to be president of a political organisation like the Muslim League and the sooner the League freed itself of his leadership and of men of his temperament the better would it be.'' (M.A.H. Ispahani, Quaid-e-Azam As I Knew Him, Karachi, 1966, pp 121-22)

কে কাকে অযোগ্য বলে এবং বিতাড়িত করে। মুসলিম লীগ মওলানাকে বহিষ্কার করে নি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মওলানাই বরঞ্চ মুসলিম লীগ ত্যাগ করে প্রথমে ওই দলটিকে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত করেছেন, এবং পরে পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দী দাঁড়ান নি। তিনি বরঞ্চ ওই রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছেন, দাঁড়িয়েছেন পুঁজিবাদবিরোধী মওলানা ভাসানী।

৩.

তারপর? পাকিস্তান তো বিদায় হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র এবং সমাজ গণতান্ত্রিক হয়েছে কি? গৃহকে অন্ধকূপ হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত করার জন্য যে আর্থ-সামাজিক মুক্তি প্রয়োজন তা এসেছি কি?

মোটেই না। হ্যাঁ, একটা আশা, হয়তো-বা এক ধরনের সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্রের সংবিধানে অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের স্থাপনা ঘটেছিল; ১৯৭৫-এর পরে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে, এবং এখন গণতন্ত্রও চতুষ্পার্শ্বে নেই। সামরিক শাসনের পরে নির্বাচিত সরকারের আসা-যাওয়া ঘটছে, কিন্তু সকল সরকারকেই দেখা যাচ্ছে সমানভাবে স্বৈরাচারী ও লুণ্ঠনপারঙ্গম। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ থেকে দূরে যাওয়া অনেক দূরের কথা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির ভেতরই ব্যক্তির মুক্তি নিহিত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত স্বপ্নের আঘাতে সমষ্টিগত মুক্তির স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে।

আদি সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক

সংগ্রামের' উল্লেখ ছিল; সেখানে ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের জারি করা সামরিক ফরমান দ্বারা সংশোধিত হয়ে যা এসেছে তা হলো 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ।' একাত্তরের যুদ্ধটা ছিল মুক্তির, এবং সেই যুদ্ধটি ছিল একটি ধারাবাহিক সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ, তাকে মুক্তির নয় কেবল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে পরিণত করাটা মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। এর অর্থ হলো রাষ্ট্রকে পুনরায় পরিত্যক্ত আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী 'চরিত্রের' জায়গাতে ঠেলে দেওয়া। সংশোধিত প্রস্তাবনাটির প্রারম্ভে প্রস্তাবনার ওপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সন্নিবেশিত হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা'। ১৯৭৮-এর পরে অনেক ক'টি সরকার আসা-যাওয়া করেছে কিন্তু কোনো সরকারই সংবিধানের আদিরূপটিকে পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ নেয় নি; এরশাদের সামরিক সরকার তো বরঞ্চ রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে যুক্ত করে দিয়ে আরো এককাঠি ওপরে উঠেছে।

আমাদের রাষ্ট্র শক্তিশালী নয়, এ রাষ্ট্র ব্যর্থ, ইত্যাদি নিয়ে অনেক বুদ্ধিমান মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁদের অসন্তুষ্টি ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্র আসলে যথেষ্ট শক্তিশালী, মানুষের ওপর নিপীড়ন সে সমানে চালাচ্ছে। তাছাড়া যা দরকার তা তো রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধি নয়, উল্টো আমরা চাইবো রাষ্ট্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সর্বস্তরে ক্ষমতার ওপর জনগণের কর্তৃত্ব; দুঃখ তো আসলে এইখানে যে, তেমনটা ঘটছে না।

রাষ্ট্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তরুণেরা বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু পাকিস্তান আমলে আমরা দেখেছি রাষ্ট্র কেমন নির্মমভাবে সেইসব উঠতি বিদ্রোহীদের ভেতর সবচেয়ে যারা মেধাবী তাদেরকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রের সেবক, ক্ষেত্রবিশেষে দাসানুদাসে পরিণত করেছে, এবং লেলিয়ে দিয়েছে জনগণের বিরুদ্ধে। একই ঘটনা বাংলাদেশ আমলেও ঘটেছে; তবে তখন কেবল রাষ্ট্র নয়, নিয়োগকারী হিসাবে বহুজাতিক কোম্পানি এবং তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যুক্ত হয়েছে; দেশ একই সঙ্গে মেধা ও প্রতিবাদশূন্য হয়ে পড়ছে। ওদিকে পুঁজিবাদের নির্বিচার দৌরাত্ম্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা পরিণত হচ্ছে রাজাকারে।

পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী রূপটি এখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভয়ঙ্কর। তার অপ্রতিরোধ্য তৎপরতায় মানুষের মনুষ্যত্ব, প্রকৃতি, মাতৃভাষা, স্থানীয় সংস্কৃতি সবকিছু পদদলিত হচ্ছে। নানা ধরনের যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলছে; এবং তাতে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হচ্ছে নারী ও শিশু। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর আগে যা অকল্পনীয় ছিল তাই ঘটছে, সেখান থেকে মেয়েরা পাচার হচ্ছে, এবং দেশের ভেতরে বিক্রয়যোগ্য অন্যসব পণ্য হারিয়ে অনেকে এখন নিজের দেহ বিক্রি করছে। চীন অবিশ্বাস্যরকম উন্নতি করেছে, কিন্তু তার মাশুল গুনছে গ্রামের মানুষ, যারা উৎপাটিত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা থেকে। নদীগুলোর অর্ধেক দূষিত হয়ে গেছে, শহরগুলোর এক তৃতীয়াংশে এখন অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। গ্রিন হাউজ গ্যাস উদ্‌গীরণে চীনের স্থান এখন দ্বিতীয়, ধারণা করা হয় যে প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রকে সে হারিয়ে দিয়ে প্রথম স্থানই দখল করে নেবে।

মার্কিনিদের দখলদারিত্বে ইরাকের মানুষ এখন দিশেহারা; ফিলিস্তিনে মেয়েরা লড়ছে মার্কিন মদদপুষ্ট ইজরায়েলিদের বিরুদ্ধে। অবরুদ্ধ আফগানিস্তানে অসহায় মেয়েরা আত্মহত্যা করছে। আর ওই যে ভয়াবহরকমে পিতৃতান্ত্রিক ইজরায়েল, যে প্রতিদিন ফিলিস্তিনিদের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করে চলেছে, তার রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে ধর্ষণের, সাবেক প্রধানমন্ত্রী অভিযুক্ত হয়েছিলেন দুর্নীতির দায়ে। পুঁজিবাদীরা উন্নতি বিধানের কথা বলে, কিন্তু বিশ্বব্যাংকের লোকেরা এখন নিজেরাই স্বীকার করছেন যে উন্নয়নের ফলে ধনীদেরই উপকার হচ্ছে, গরিবদের বাড়ছে দুর্দশা। ওদিকে ১৯৯৬ সালে খাদ্যের বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলনে বলা হয়েছিল ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অচিরেই অর্ধেক করা হবে; দশ বছর পরে দেখা যাচ্ছে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কমবে কি বরঞ্চ বেড়েছে।

পুঁজিবাদী বিশ্বে সঙ্কট বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে; নির্বাচনে জনমতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটছে না, এবং বুশ-ব্লেয়ারের মতো নিম্নমানের মানুষেরা নির্বাচিত হচ্ছেন টাকাওয়ালাদের আনুকূল্য লাভ করে। এই সঙ্কটকে আচ্ছাদন দেবার চেষ্টায় ধর্মের ব্যবহার শুরু হয়েছে। দখলকারীদের অভিযানকে বলা হচ্ছে খ্রিস্টান সভ্যতার সঙ্গে ইসলামী সভ্যতার দ্বন্দ্ব; তাই ক্রুসেড নাকি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। আর ক্রুসেড যদি আসে তবে জেহাদ কেন আসবে না? আসছে বৈকি। এই যে ক্রুসেডার এবং জেহাদী এদের ঝগড়াটা কিন্তু আসলে ভ্রাতৃকলহ; কেননা আদর্শগতভাবে এরা উভয়েই পুঁজিবাদের সমর্থক, এবং দৃঢ়ভাবে পিতৃতান্ত্রিকতায় আস্থাশীল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে সভ্যতাকে এরা পেছনের দিকে ঠেলছে, মানুষ যাতে সামনের দিকে, অর্থাৎ গণতন্ত্রের অভিমুখে যেতে না-পারে সেটা নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে। দু'পক্ষই আবার একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপরে।

৪.

বাঙালি সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতা অত্যন্ত প্রাচীন ও গভীরে প্রোথিত। সমাজ এখানে সব সময়েই বৈষম্যমূলক; এবং সেই বৈষম্যের নির্যাতন সবচেয়ে বেশি সহ্য করতে হয়েছে মেয়েদেরকেই; তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার কারণে। হাজার বছর আগে রচিত 'চর্যাপদে' মেয়েদের দুর্দশার যে ছবি দেখি, আজকের বাংলাদেশে তা যে অনুপস্থিত তেমনটা বলা যাবে না। একশ' বছর আগে পদ্মার ধারে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন, "গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো নিত্যকর্ম করে যায়– সে-দৃশ্য কোনো মতেই ভালো লাগে না।" সহিষ্ণু জন্তুর মতো নিত্যকর্মরত নারীর এ দৃশ্য এখনও দেখা যাবে, কেবল গ্রামে নয়, শহরের বস্তিতেও। তৈরি পোশাক শিল্পের মেয়েরা কিভাবে থাকে, কোথায় থাকে, কেমন তাদের জীবনযাপন সে-খবর আমরা ক'জন রাখি, কেবল এটুকুই জানি যে ওই শিল্প দেশের দারুণ উপকার করছে। ক্ষুদ্র ঋণের গ্রহীতা মেয়েদের পারফরমেন্স এখন সারা বিশ্বে নন্দিত, কিন্তু ওই ঋণের সুদের হার যে শতকরা ২০ থেকে ২৫ সে-খবর আমাদের বিবেককে পীড়িত করে বলে তো মনে হয় না। হয়তো সেটা কোনো খবরই নয়।

পেছনে ফিরে তাকালে এটাও দেখবো উপমহাদেশে জাতির পিতারা নিরাপদে থাকেন নি। গান্ধী ও মুজিব উভয়েই প্রাণ হারিয়েছেন ঘাতকের গুলিতে, জিন্নাহ মারা গেছেন অবিশ্বাস্য রকমের রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞার মধ্যে। পিতৃতান্ত্রিকতা সর্বত্রব্যাপ্ত বলেই হয়তো বা পিতারা তাঁদের যোগ্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন– পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে। বাইরে থেকে দেখলে অন্যদের তুলনায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মনে হবে বেশ পিতৃতান্ত্রিক

বাঙালির রসিকতা পুরনো দিনের কবিতাতে যেমন আধুনিক সমাজেও তেমনি বিশেষভাবে উপাদেয় হয় যখন তা মেয়েদেরকে জড়িয়ে নেয়। নারীকে নির্দ্বিধায় 'রমণী' বলা হয়; এবং অনেকেরই বিনোদন লিপ্সা নারীকেন্দ্রিকতাকে ছাড়িয়ে এগুতে পারে না। পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্র যা ঘটে এখানেও তাই ঘটছে, মেয়েদের নিরাপত্তা এখানে কম, পুরুষের তুলনায়। দুর্ভিক্ষে ও অভাবে স্বামী স্ত্রীকে অনায়াসে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। যৌতুকের জন্য পীড়ন অব্যাহত থাকে। এমনিতে মায়ের খবর করা হয় না, কিন্তু গালাগাল দেবার সময় মা'কে ঠিকই জনসমক্ষে এনে হাজির করা হয়। সব সময়েই নারীই পতিত হয়, তাকেই পতিতা নাম দেওয়া হয়, যেন পুরুষের পতন ঘটে না, ঘটতে নেই, তা পুরুষ যত দুর্বৃত্তই হোক না কেন।

তাই বলে পিতার যে সম্মান আছে সেটাও বলবার উপায় নেই।

পিতাকে নত, অনুগত, কৃপাপ্রার্থী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অপারগ ইত্যাদি দেখে পিতৃভক্তি যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের এক সময়ের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র তাঁর শোনা একটি গল্প স্মরণ করেছেন।

> *ঢাকার কোনো বস্তি থেকে আদালতে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে এসেছে। উকিলের প্রশ্ন, তেরা নাম বাতা। উত্তর, হুজুর, কেরামত আলী। উকিলের প্রশ্ন, তেরা বাপকা নাম বাতা। 'হুজুর, রহমত আলী'। 'তেরা বাপকা বাপকা নাম বাতা'। 'সেলামত আলী হুজুর'। 'ইস দফে তেরা বাপকা বাপকা বাপকা নাম বাতা।' 'ইমারত আলী, হুজুর।' 'আভি উসকা বাপকা নাম বাতা।' 'মাফ কিজিয়ে হুজুর, উ শালা হিন্দু থা।' [আমারে তুমি অশেষ করেছ, সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০৪, পৃ ১০১]*

গল্প ঠিকই, তবে একেবারেই যে বাস্তবতাবর্জিত তা বোধ করি না। এতে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ আছে অবশ্যই, কিন্তু আরো অধিক মাত্রায় যা রয়েছে তা হলো পিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আস্থার নিদারুণ অভাব। পিতারা যথেষ্ট পিতা নয়, তা বাপের ব্যাটারা যতই না বড়াই করুক, কিংবা বড় বাপের পোলারা যতই না বিশেষ বিশেষ খাবারের গ্রাহক হোক।

আমাদের জন্য একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অহঙ্কারের সঙ্গত কারণ আছে অবশ্যই। কিন্তু ওই যুদ্ধে মেয়েদের কী দুর্দশা হয়েছিল তা পরিমাপ করা যাবে না। পুরুষের পক্ষে তবু সম্ভব ছিল সরে যাওয়া, কিন্তু মেয়েরা আটক থেকেছে। অন্ধকূপ মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়েছে তাদের জন্য। কোনো পরিসংখ্যানই মেয়েদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, পীড়া, যন্ত্রণার ধারণা দিতে পারবে না। এমনকি পরিসংখ্যানও তো নেই।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের পরে কি ঘটেছে? মেয়েদের নিরাপত্তা কী বেড়েছে? মোটেই না। কারখানায়, নির্মাণস্থানে, ক্ষুদ্র ঋণে নারীর আবদ্ধ থাকাটা নিশ্চয়ই মুক্তির কোনো লক্ষণ নয়। ঘরে ঘরে মেয়েরা লাঞ্ছিত। দগ্ধ হচ্ছে অ্যাসিডে। পুরুষের দৃষ্টি ও মন্তব্য থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিচ্ছে বোরখায়, আটক থাকছে গৃহকোণে। মেয়েদের চলাফেরা পদে পদে বিঘ্নি-ত, তা তারা যতই শিক্ষিত হোক, কিংবা কর্মদক্ষ বলে প্রমাণ করুক নিজেদেরকে। এবং পাচার হচ্ছে। একটি তথ্যসূত্র বলছে প্রত্যেক বছর বাংলাদেশ থেকে কমপক্ষে ১৫ হাজার নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হয়, বিক্রির জন্য। এরা যাচ্ছে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানে। হ্যাঁ, সেই পাকিস্তানেও যে-পাকিস্তান একাত্তরে আমাদের ওপর অস্ত্রবল ও মনুষ্যত্বহীনতার পরীক্ষা দিয়েছে, এবং যেখানে কিছুদিন আগ পর্যন্ত ধর্ষণের অভিযোগ আনলে অভিযোগকারীকে চারজন পুরুষ সাক্ষী এনে হাজির করতে হতো, এবং আনতে না পারলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলা দায়েরের বিধান ছিল।

একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে দেড় লক্ষ অনন্যোপায় মেয়ে নিজেদের দেহ বিক্রি করে টিকে থাকার ভয়াবহ সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। Commercial Sex-workers in Bangladesh (Edited Amena Mohsin & Saima Ahmed), Dhaka 2006 নামে প্রকাশিত এই সমীক্ষাটিতে কয়েকজন তথাকথিত Sex-worker-এর সাক্ষাৎকার রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তাদের দুর্দশার কারণ পিতার ব্যর্থতা। পিতা নিজেও অবশ্য ব্যবস্থা ও পরিস্থিতির শিকার। এই মেয়েদের কারো কারো সন্তান রয়েছে; সেই সন্তান লালনপালনের ব্যাপারে সন্তানের পিতার কোনো ভূমিকা নেই, সব দায়িত্ব মায়েরই। এবং এই মায়েদের জন্য সবচেয়ে বড় ভয় আপন সন্তানকেই, সন্তান যদি মা'কে ঘৃণা করতে শুরু করে তবে তার জন্য বাঁচার আর কোনো অবলম্বন বাকি থাকবে, তাদের প্রশ্ন সেটাই। আর যারা এই মেয়েদের 'কাজ' ক্রয় করে তাদের জোরটা কেবল যে টাকার তা নয় সেই সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিকতারও।

আমাদের এই অবরুদ্ধ জনপদে মানুষের জীবনে অর্জনের ঘটনা অল্প, বেকারত্ব এখানে ভয়াবহ, মাদ্রাসা শিক্ষায় বিস্তারের আগ্রহের ক্ষেত্রে সরকার ও সমাজ পরস্পরের প্রতিযোগী, যার ফলে ইসলামী জঙ্গির প্রাদুর্ভাব– সব মিলিয়ে ভবিষ্যৎ মনে হয় অন্ধকার, যে-অন্ধকার বিশেষভাবে দুর্বিষহ মেয়েদের জন্য।

৫.

কিন্তু এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই মেনে নেবো না। তাহলে প্রতিকার কি? বলা যাবে প্রদীপ জ্বালা চাই। অবশ্যই। কিন্তু কত প্রদীপ, কত ঘরে, কত জায়গায়? শিক্ষা, আরো শিক্ষা, তারপরও শিক্ষা– এ মূলমন্ত্র ঠিকই আছে, কিন্তু এতো অনেক কাল ধরেই যপছি আমরা, তাতে রাষ্ট্র ও সমাজে তো কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে বলে প্রমাণ পাচ্ছি না, অন্ধ কূপগুলো তো রয়েই যাচ্ছে।

আসলে তাকানো চাই মূল ব্যাপারটার দিকে। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে বৈষম্য, যে-বৈষম্যকে রাষ্ট্র ও সমাজ নিজ হাতে তৈরি করে, লালনপালন অব্যাহত রাখে। এবং রক্ষা করে চলে। শ্রেণীবৈষম্য আছে; সঙ্গে রয়েছে নারী-পুরুষে বৈষম্য। এই দ্বিতীয় বৈষম্যটি সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে। নারীর নারী হয়ে জন্মানো অভিশাপের বিষয়ে তাঁর মতো সচেতন মানুষ সে-কালে কমই ছিলেন; তিনি প্রাচীন শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, নারীশিক্ষার সুদৃঢ় সমর্থনে ছিলেন দৃঢ়সঙ্কল্প; তবে তাঁকেও দেখছি মেয়েদের জন্য তৈরি পাঠ্যসূচিতে লিখনপঠন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ, সেলাইয়ের কাজ এসব কিছুর স্থান দিচ্ছেন কিন্তু বিজ্ঞানের কথা বলছেন না, অথচ তাঁর কয়েক যুগ আগে রামমোহন বলেছেন শিক্ষার প্রধান উপাদানই হবে বিজ্ঞান। আমরা এও জানি যে, নারীশিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল খোলার সরকারি উদ্যোগকেও বিদ্যাসাগর সমর্থন করেন নি। উভয় ক্ষেত্রেই কারণ অভিন্ন। বাস্তববাদিতা। সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের অগ্রসর চিন্তার মানুষদেরকেও নারী পুরুষের সমান সুযোগের পক্ষে দাঁড়াবার ব্যাপারে সমর্থন যোগায় নি।

ধনবৈষম্য এবং নারীপুরুষ বৈষম্য দুটোই দূর করা চাই। অর্থাৎ চাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ। সে-সমাজে নিপীড়ন থাকবে না, থাকবে মৈত্রী; পিতৃতান্ত্রিকতার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে ভাইবোনের সহযোগিতা। মানুষের জীবন ভরে উঠবে নতুন নতুন সৃষ্টিশীলতায়, বিনোদন নিষ্ক্রিয় থাকবে না, হবে সক্রিয়; কেউ শিকার কেউ শিকারি এমন ঘটনা ঘটবে না, সকলেই হবে সকলের বন্ধু। সেই সমাজে মানুষ মুক্তি পাবে আরো একটি বন্ধন থেকে; সেটি হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির ও ভোগবাদিতার লিপ্সা; লিপ্সা নয় একে দাসত্বই বলা চলে।

এর জন্য ব্যক্তিগত বিদ্রোহ যথেষ্ট নয়; চাই গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট লক্ষ্যে সুসংগঠিত আন্দোলন। ব্যক্তিগত বিদ্রোহের পরিকল্পনা শেকসপিয়রের ক্যালিবানও করেছে, প্রসপেরোর বিরুদ্ধে; কিন্তু তার স্বপ্নটা ছিল জবরদখলকারী প্রসপেরোকে হত্যা করে সে নিজেই একজন প্রসপেরো হবে, এবং প্রসপেরো-কন্যা মিরান্ডার ওপর নির্যাতন চালিয়ে অসংখ্য ক্যালিবান দিয়ে তার দ্বীপটিকে ভরে ফেলবে। বলা বাহুল্য, এমন বিদ্রোহে ব্যবস্থা বদলায় না, শুধু লোক বদলায়। প্রয়োজন তাই ব্যবস্থা বদলের।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় কেবল অধিক নিরাপদ, নির্বিরোধী ও দক্ষ হবে তাই নয়, তার চেয়েও বড় কথা যেটা তা হলো এই ব্যবস্থা হবে মানবিক; পুঁজিবাদ মানুষের যে মনুষ্যত্ব হরণ করছে গণতন্ত্র তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং মানুষের অন্তর্গত সত্তার সঙ্গে তার বস্তুগত অভিজ্ঞতার ক্রমবর্ধমান পার্থক্য ঘুচিয়ে দেবে। মানুষ আর বিচ্ছিন্ন ও আত্মস্বার্থসর্বস্ব প্রাণী থাকবে না, সামাজিক মানুষ হয়ে উঠবে এবং সমাজ হবে নদীর মতো স্বচ্ছ ও প্রবহমান; হবে না সড়কের মতো বিপদসঙ্কুল ও বিপথগামী।

পুঁজিবাদি এখন মানুষের সবচেয়ে কদর্য শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে সংগ্রাম চলছে। সেই সংগ্রামে আমরাও যোগ দেবো, স্থানীয়ভাবে ঠিকই, কিন্তু আন্তর্জাতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। ভাইরা থাকবেন, বোনেরা থাকবেন, যেমন ছিলেন বাহার-নাহার; ছিলেন রোকেয়া ও ইব্রাহিম সাবের। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ছাত্রী হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্ররা ফজিলাতুননেসাকে এক সম্বর্ধনা দেন; সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন, আমরা বোনেরা এগিয়ে যাবো, ভ্রাতারা যদি সহায় হোন। ভ্রাতারা যে সহায় হয়েছেন, এমন বলা যাবে না; কিন্তু হওয়াটা প্রয়োজন, বিশেষ করে এই জন্য যে ভ্রাতারা তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন, ভগ্নিদের তুলনায়। এবং ভ্রাতাভগ্নি উভয়েই পিতৃতান্ত্রিকতার দ্বারা পীড়িত।

(প্রয়াত সেলিনা বাহার জামানকে স্মরণ করে)